কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' ঃ

একদিকে যেমন দার্শনিকতাবোধ তেমনি অপরদিকে যুক্তিশাস্ত্রে পরম প্রাজ্ঞ ছিলেন কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ। বাংলাদেশের পরম সৌভাগ্য যে, মধ্যযুগে কৃষ্ণদাস কবিরাজের মত একজন দার্শনিক কবির আবির্ভাব হয়েছিল। পাণ্ডিত্য, মনীষা, দার্শনিক ভূয়োদর্শন, রসশাস্ত্রে অগাধ অধিকার প্রভৃতি বিবেচনা করলে কবিরাজ গোস্বামীকে মধ্যযুগের ভারতীয় সাহিত্যেও তুলনাহীন মনে হয়। নিছক চৈতন্যদেবের বস্তুগত, তথ্যবহ ও ঐতিহাসিক ঘটনাপঞ্জী সঙ্কলন তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। তাই তিনি প্রচলিত কাহিনির পুনরাবৃত্তি না করে চৈতন্য জীবনাদর্শ, ভক্তিবাদ, দ্বৈতবাদী দার্শনিক চিন্তার গৌড়ীয় ভাষ্য ও বৈষ্ণব

মতাদর্শকে সংহত, দূরাভিসারী ও মনন-নিষ্ঠ আকার দিয়ে বাঙালি মনীষার এক স্মারক চরিত্র হয়ে আছেন।

কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর 'চৈতন্যচরিতামৃত' কাব্যের 'আদিলীলা'র পঞ্চম পরিচ্ছেদে সংক্ষেপে যে আত্মপরিচয় দিয়েছেন, তা থেকে জানতে পারি বর্ধমান জেলার কাটোয়ার কাছে ঝামাটপুর নামক গ্রামে কবির বাস ছিল। তাঁর পারিবারিক অবস্থা যথেষ্ট সচ্ছল ছিল। কারণ তাঁদের গৃহদেবী শ্রীমূর্তি পূজার জন্য গুণার্ণব মিশ্র নামে এক পূজারী রাখা ছিল। এ প্রসঙ্গে কবির স্বগতোক্তি—

''গুণার্ণব মিশ্র নামে এক বিপ্র আর্য্য।
শ্রীমূর্ত্তি-নিকটে তেঁহো করে সেবা কার্য্য।। ১৪৬''[৫৫]

আবার 'চৈতন্যচরিতামৃত' কাব্যপাঠে জানতে পারি, কবিদের বাড়িতে নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠান, নাম-সঙ্কীর্তন প্রভৃতির ব্যবস্থা চলত। এরকমই একদিন তাঁদের বাড়িতে হরিনাম সঙ্কীর্তনে নিত্যানন্দের এক শিষ্য মীনকেতন-রামদাস আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন। তিনিও পরম ভক্ত ছিলেন। সঙ্কীর্তনের আসরে নৃত্যগীতে যোগ দিয়ে তিনি যখন—

'' 'নিত্যানন্দ' বলি যবে করেন হুঙ্কার।
তাহা দেখি লোকের হয় মহা চমৎকার।। ১৪৫''[৫৬]

কিন্তু তখন বৈষ্ণব সমাজে নিত্যানন্দবিরোধী দলের সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল না। কৃষ্ণদাসের পূজারি ব্রাহ্মণ গুণার্ণব মিশ্রও সেই দলভুক্ত ছিলেন। তিনি রামদাসকে কোনওরূপ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন না। রামদাস গুণার্ণবের এই ব্যবহারে মনে মনে ক্রুদ্ধ হন। কিন্তু তাঁর এই ক্রোধের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পায় যখন, কবি কৃষ্ণদাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতাও নিত্যানন্দের প্রতি বিশেষ ভক্তি প্রদর্শন করেন না। কবির সেই কনিষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে রামদাসের নিত্যানন্দকে কেন্দ্র করে কিছু বাদানুবাদও হয়। কবি তাই তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা সম্পর্কে প্রসঙ্গতই বলেছেন—

''চৈতন্যগোসাঞিতে তাঁর সুদৃঢ় বিশ্বাস।
নিত্যানন্দ-প্রতি তাঁর বিশ্বাস-আভাস।। ১৫১''[৫৭]

সুতরাং বুঝতে পারি, নিত্যানন্দ সম্বন্ধে কবির কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিশেষ ভক্তি বা বিশ্বাস ছিল না। আর এই কারণেই তাঁর সঙ্গে নিত্যানন্দের শিষ্য রামদাসের বাদানুবাদ হয়। তবে, কবি কৃষ্ণদাস কিন্তু চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দ উভয়কেই সমশ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতেন। তাই রামদাসের প্রতি অশ্রদ্ধা করবার জন্য তিনি অনুজকে কিঞ্চিৎ ভর্ৎসনাও করেন। কবি জানিয়েছেন, সেই দিন রাত্রেই নিত্যানন্দ তাঁকে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে বলেন—

''ভাইকে ভর্ৎসিনু মুঞি, লঞা এই গুণ।
সেই রাত্রে প্রভু মোরে দিল দরশন।। ১৫৮
নৈহাটী নিকটে ঝামটপুর-নামে গ্রাম।

তাঁহা স্বপ্নে দেখা দিলা নিত্যানন্দ রাম।। ১৫৯
দণ্ডবৎ হৈয়া আমি পড়িনু পায়েতে।
নিজপাদপদ্ম প্রভু দিলা মোর মাথে।। ১৬০
'উঠ উঠ' বলি মোরে বোলে বারবার।
উঠি তাঁর রূপ দেখি হৈনু চমৎকার।। ১৬১
... ...
'অয়ে অয়ে কৃষ্ণদাস না কর ত ভয়।
বৃন্দাবনে যাহ, তাঁহা সর্ব্ব লভ্য হয়'।। ১৭৩
এত বলি প্রেরিলা মোরে হাতসানি দিয়া।
অন্তর্ধান কৈলা প্রভু নিজগণ লঞা।। ১৭৪ "[৫৮]

এরপর সেই স্বপ্নাদেশানুসারে কৃষ্ণদাস বৃন্দাবনে গিয়ে উপস্থিত হন এবং সেখানে রূপ-সনাতন প্রভৃতি বৃন্দাবনের গোস্বামীদের কাছ থেকে বৈষ্ণব শাস্ত্র ও দর্শন সম্পর্কিত শিক্ষা লাভ করতে শুরু করেন। যেহেতু নিত্যানন্দের স্বপ্নাদেশের কারণেই তিনি বৃন্দাবনে আসতে পেরেছিলেন, তাই নিত্যানন্দের প্রতি বারবার প্রণাম নিবেদন করেছেন কবি—

"জয় জয় নিত্যানন্দ নিত্যানন্দ রাম।
যাঁহার কৃপাতে পাইনু বৃন্দাবনধাম।। ১৭৮
জয় জয় নিত্যানন্দ জয় কৃপাময়।
যাঁহা হৈতে পাইনু রূপ-সনাতনাশ্রয়।। ১৭৯
যাঁহা হৈতে পাইনু রঘুনাথ মহাশয়।
যাঁহা হৈতে পাইনু শ্রীস্বরূপ-আশ্রয়।। ১৮০
সনাতন-কৃপায় পাইনু ভক্তির সিদ্ধান্ত।
শ্রীরূপ কৃপায় পাইনু ভক্তিরস প্রান্ত।। ১৮১
জয় জয় নিত্যানন্দ-চরণারবিন্দ।
যাঁহা হৈতে পাইলাম শ্রীরাধাগোবিন্দ।। ১৮২"[৫৯]

সুতরাং কবির এই আত্মপরিচয় থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট যে, তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন ঠিকই, কিন্তু কখনোই দাম্ভিক ছিলেন না। সত্যকে তিনি স্পষ্ট স্বীকারোক্তির মাধ্যমে সহজ করেই বলতেন। আর তাই কৃষ্ণদাসের মত পাণ্ডিত্য, রসবোধ ও জ্ঞান গভীরতা মধ্যযুগের ভারতীয় মনীষিদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া কঠিন। অসাধারণ পাণ্ডিত্যের সঙ্গে সুগভীর রসবোধ ও সুপ্রতীত দার্শনিক প্রত্যয় এবং তার সঙ্গে আদর্শ বৈষ্ণব জনোচিত বিনয় আধুনিক কালের পাঠককেও বিস্মিত করে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, বৃন্দাবন দাস যেখানে

শ্রোতা ও পাঠকদের উদ্দেশ্যে বলেন—

"এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে নাথি মারোঁ তার শিরের উপরে।। ৪২৬"[৬০]

সেখানে কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রোতা ও পাঠকদের চরণে মিনতি করেন এই বলে যে—

"সব শ্রোতাগণের করি চরণবন্দন।
যা সভার চরণকৃপা শুভের কারণ।। ১৪১
চৈতন্যচরিতামৃত যেই জন শুনে।
তাঁহার চরণ ধুঞা করোঁ মুঞি পানে।। ১৪২
শ্রোতার পদরেণু করোঁ মস্তকে ভূষণ।
তোমরা এ অমৃত পীলে সফল হয় শ্রম।। ১৪৩
শ্রীরূপ-রঘুনাথ- পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।। ১৪৪"[৬১]

সুতরাং, উপরে উল্লিখিত এই উভয় কবির উক্তি দুটির সুর মিলিয়ে দেখলেই বোঝা যায়, কৃষ্ণদাস কবিরাজের চিত্তে বিদ্যা ও বিনয় বৃন্দাবন দাসের চেয়ে কত বেশি ছিল।

অবশ্য অনেকে কবিরাজ গোস্বামীর রচনায় ও ব্যক্তিত্বে নানা ত্রুটি আবিষ্কার করেন। তাই অনেকে বলে থাকেন, তিনি নাকি বৃন্দাবনের গোস্বামীদের দার্শনিক চিন্তা বেমালুম চৈতন্যের মুখে বসিয়ে দিয়েছেন। আবার অনেকে বলে থাকেন, তিনি চৈতন্যদেব সম্পর্কিত এমন অনেক ঘটনা লিখেছেন যার ঐতিহাসিক ভিত্তি একেবারেই নেই। এ প্রসঙ্গে মনে হয়, সত্যিই কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবনের গোস্বামীদের গ্রন্থ, মতাদর্শ ও উক্তি অবলম্বনে চৈতন্যজীবনকে ঢেলে সাজিয়েছেন এবং সেই তত্ত্বাদর্শের আলোকে চৈতন্যলীলা ব্যাখ্যাও করেছেন। মূলত চৈতন্যজীবনকে বৈষ্ণব আদর্শের নিরিখে উপস্থাপনা, বৈষ্ণবধর্ম প্রসারে চেষ্টা করা— এটাই ছিল অন্যান্য চৈতন্যজীবনীকারদের মত কৃষ্ণদাসেরও উদ্দেশ্য। কাজেই চৈতন্যজীবনীতে ঐতিহাসিক তথ্যাদি ও বাস্তব ঘটনার যে মাঝে মাঝে ক্রমভঙ্গদোষ ঘটেছে— তা স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, সমস্ত জীবনীকারদের মত কৃষ্ণদাস কবিরাজেরও উদ্দেশ্য ছিল না চৈতন্যজীবনী ও চৈতন্যজীবনাদর্শ বর্ণনায় ঐতিহাসিকতার পুঙ্ক্ষাণুপুঙ্ক্ষ বর্ণনা করা। মূলত দার্শনিকবোধ সমৃদ্ধ জীবনচরিত রচনা করাই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কৃষ্ণদাস কবিরাজের।

আর তাই কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজের দার্শনিকতা বোধের পরিচয় পাই বাসুদেব সার্বভৌম ও রায় রামানন্দের সঙ্গে চৈতন্যদেবের তাত্ত্বিক আলোচনা বর্ণনায়। এই বৈষ্ণবীয় তাত্ত্বিক দর্শন উপস্থাপনে কবি যুক্তিমার্গই অবলম্বন করেছেন। অবশ্য এই যুক্তি আলোচনা আজকের আধুনিক পাশ্চাত্য যুক্তিবিজ্ঞানীর মত শুধু প্রত্যভিজ্ঞামূলক বস্তু প্রতীতি নয়। কারণ মধ্যযুগের সাহিত্যিকদের কোনও চিন্তানায়কের কাছ

থেকে এ ধরনের বস্তু প্রত্যয়গত জ্ঞানবাদ আশা করা যায় না। তাই কৃষ্ণদাস নির্মোহ সংস্কার মুক্ত যুক্তিবাদের অবলম্বন না করে, বৈষ্ণব দর্শনের মূল কথা যে বিশ্বাস, প্রেম, ভক্তি, নিষ্ঠা— এর সাহায্যেই চৈতন্যজীবন চরিত রচনা করেছিলেন। মূলত কৃষ্ণদাস কবিরাজের কাব্য রচনার প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল চৈতন্যজীবনী অপেক্ষা চৈতন্যতত্ত্ব, গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন প্রভৃতি দুরূহ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করা। আর এ কারণে ঐতিহাসিক ক্রমের যথার্থ ব্যবহার তিনি মাঝে মাঝে করতে পারেন নি। তবে মধ্যযুগের এরূপ একজন সাধক প্রকৃতির কবি-দার্শনিক বাংলাদেশে জন্মেছিলেন এবং এজন্য বাংলাদেশ যে ধন্য হয়েছে— একথা বলা যেতেই পারে।

তাছাড়া বাংলাসাহিত্যের অ-বৈষ্ণব পাঠকের কাছেও ‘চৈতন্যচরিতামৃত’ কাব্যটির মহিমা অতুলনীয়। এই মহাগ্রন্থ আসলে বাংলা ভাষা সাহিত্যের সুমহৎ সম্পদ। আমরা জানি, বাংলা সাহিত্যের ধনভাণ্ডার দ্বিধা বিভক্ত; এর একদিকে যেমন আছে সৃজনশীল মৌলিক শিল্প রচনার ধারা তেমনি অপরদিকে আছে ভাষার অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডার। প্রথমটির উৎস যদি হয় মনের মুক্তিতে, দ্বিতীয়টির পরিণতি তবে মননের গভীরতায়। আর এই দ্বিবিধ সাহিত্যিক উপাদানের মধ্যে রয়েছে পারস্পরিক অপেক্ষমানতার সম্পর্ক। আসলে যে কোন ভাষাতেই মননশীল রচনার সমৃদ্ধি যদি না থাকে, তাহলে সে ভাষার মনোময় সৃষ্টি দুর্বল ও ভাবালু হয়ে পড়তে বাধ্য। আর এই কারণে দর্শন-বিজ্ঞান, যুক্তি-তর্ক প্রধান গাঢ়বন্ধ রচনাও সাহিত্যের শিল্পসমুন্নতির জন্য অপরিহার্য। আর এদিক থেকে কৃষ্ণদাস করিরাজের ‘চৈতন্যচরিতামৃত’ যে সর্বকালের বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ— সেকথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

আবার মূলগত স্বভাবেও ‘চৈতন্যচরিতামৃত’ কেবল একটি দার্শনিক মহাগ্রন্থই নয়, বৈষ্ণব ধর্মশাস্ত্র ও অভ্যন্তরীণ বৈষ্ণব ভক্তি-বিশ্বাসের সমন্বয়ে সৃষ্ট এক ঐতিহাসিক দলিল বলেই মনে হয়। তবে এই ভক্তি বিশ্বাসের প্রাণপুরুষ কৃষ্ণদাস কবিরাজ কেবল দার্শনিক বা ঐতিহাসিক পণ্ডিত নন, মূলত তিনি ছিলেন ভক্ত কবি। আর তাই ভক্তির আবেগ নিয়ে তিনি চৈতন্যদেবের নরলীলা বর্ণনা করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন বলেই অলৌকিক অবিশ্বাস্য কিছু কাহিনিকেও বিশ্বাসের বাণীরূপ দিতে পেরেছেন। এককথায় নিষ্ঠা ও ভক্তির সমন্বয়ে কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ যে সাফল্য অর্জন করেছেন — তা অন্য কোনও চরিতকার দেখাতে পারেন নি। যাই হোক, প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয় যে, কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজের ‘চৈতন্যচরিতামৃত’ কাব্যে যে চৈতন্যজীবন-দর্শন পরিস্ফুট হয়েছে তার সামগ্রিক চিত্রের অন্বেষণ এবং এই কাব্যটির সঙ্গে প্রথম বাংলা চৈতন্যজীবনীকার বৃন্দাবন দাসের ‘চৈতন্যভাগবত’ কাব্যের পারস্পরিক তুলনাই আমার গবেষণা কর্মের মূল আলোচ্য বিষয়।